'সূত্রে মণিগণা ইব'

শ্রীশ্রীমায়ের আনন্দময় অভয় আশ্রয়ে কয়েকটি শিশুর উপস্থিতির স্মৃতিচিত্র আমরা আগে দেখেছি। ষোড়শতম চিত্রে দেখব একটি বালিকাকে সহজ-সরল শিশুসুলভ কথাবার্তার মাধ্যমে মায়ের সস্নেহ শিক্ষা দেওয়ার ঘটনাটি। পরিবারের সবার প্রতি সমদৃষ্টি ও প্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করার এমন সুশিক্ষা নিঃসন্দেহে দৃষ্টান্তস্বরূপ।

একটি শিশুকন্যার মা তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রায়ই শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আসতেন। শিশুটি মার কাছে এসে

সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী

প্রাক্তন সহ-গ্রন্থাগারিক, দি এশিয়াটিক সোসাইটি

তাঁকে জড়িয়ে ধরত। মা তাকে প্রচুর প্রসাদ দিতেন। একবার জয়রামবাটী যাওয়ার আগে মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তুমি কি আমাকে ভালবাস?''

''হ্যাঁ মা আমি তোমাকে খু...ব ভালবাসি।''

''কতখানি?''

শিশু তার ক্ষুদ্র দুটি হাত দুদিকে যথাসাধ্য প্রসারিত করে বলল, ''এতখানি।''

মা বললেন, ''যখন আমি জয়রামবাটীতে থাকব তখনও আমায় ভালবাসবে তো?''

''হ্যাঁ মা, তখনও আমি তোমায় ভালবাসব। আমি কখনও তোমায় ভুলে যাব না।''

''আমি কেমন করে জানব?''

''বলো, কী করলে তুমি জানতে পারবে?''

''তুমি যদি বাড়ির সবাইকে ভালবাসতে পার তা হলেই আমি বুঝব, তুমি আমায় ভালবাস।''

''ঠিক আছে, আমি তাদের সবাইকে ভালবাসব। আমি আর দুষ্টুমি করব না।''

''খুব ভাল, কিন্তু আমি কেমন করে বুঝব তুমি তাদের সবাইকে সমান ভালবাসলে—কাউকে বেশি কাউকে কম নয়?''

শিশু জানে না। মা বোঝালেন, যদি কারও কাছে কোনও প্রতিদান না চেয়েই ভালবাসা যায়, তবেই সকলের প্রতি সমান ভালবাসা হবে।

বালিকা মাকে কথা দেয়, সে প্রতিদান না চেয়েই সকলকে ভালবাসবে এবং বাস্তবিকই পরিবারে তার ব্যবহার আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।[১৮]

সপ্তদশতম চিত্রে পাওয়া যায় 'শিশু নারায়ণে'র প্রতি মায়ের সযত্ন স্নেহের দৃষ্টান্ত। চণ্ডীবালা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দজীর অগ্রজ তুলসীদাস ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা। এগারো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় কলকাতার সিমলার ডাক্তার নারায়ণচন্দ্র বসুর সঙ্গে। বিবাহের পর তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মহামন্ত্র লাভ করেন।

আশৈশব মাতৃস্নেহে ধন্য হয়েছেন চণ্ডীবালা দেবী : ''ছোটবেলায় শ্রীশ্রীমাকে দেবী বলে একদম মনে হত না। মনে হত আমাদের ঠাকুমারই কোনও দিদি যেন আমাদের আর এক ঠাকুমা। তিনি খুব আস্তে আস্তে কথা বলতেন। যখন আঁটপুরে ছিলেন নিজের থেকেই ঘরে কাজ করতেন। তিনি যখন কোনও কাজ করতেন আমার ঠাকুমা বলতেন, 'মা, ও কী করছ? তোমাকে কিছুই করতে হবে না। এরাই করে নেবে।' ছোটবেলায় একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে। আমি ঠাকুরদালানে বসে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে খেলা করছিলাম। খেলায় এতই মত্ত ছিলাম যে, পিছনে যে কাঠকয়লার কালি পড়ে রয়েছে তা খেয়াল ছিল না। সেই ভুসো কালি আমার পিছনের দিকে কাপড়ে অনেকখানি জায়গায় লেগেছিল। খেলার শেষে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন মা আমায় দেখে বললেন, 'মা, কাপড়টায় ভুসো লেগেছে ছেড়ে নাও।' তখন আমার সম্বিৎ এল। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে কাপড়জামা পালটালাম। ময়লা কাপড়গুলো দুয়ারে রেখে দিলাম। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছি। সেই অবসরে শ্রীমা সেই কাপড়জামা নিয়ে ঘাটে গেলেন। সেগুলো কেচে নিয়ে ঘরে এলেন। শ্রীমাকে এই অবস্থায় দেখে আমার মা ও ঠাকুমা আমার ওপর গেলেন চটে। তাঁরা আমাকে ভর্ৎসনা করে বলতে লাগলেন, 'তুই কিনা মাকে বলেছিস কাপড়জামা কেচে দিতে? কী পাপ যে করলি!' আমি যতই তাঁদের বোঝাতে চাইলাম যে আমি ওসব কিছুই বলিনি; কিন্তু কে কার কথা শোনে? অবশেষে শ্রীমাই দায়িত্ব নিলেন সমস্যা সমাধানের। তিনি বললেন, 'তোমরা খুকিকে বকছ কেন? ও তো আমায় কিছুই বলেনি। আমি ওর নোংরা জামাকাপড়টা কেচে দিয়েছি তো কী হয়েছে? ওরা শিশু নারায়ণ। আর ওকে কিছু বোলো না। যে যার কাজে যাও।' ''[১৯]

অষ্টাদশতম চিত্রে শ্রীশ্রীমায়ের অযাচিত স্নেহ-আশীর্বাদের অপরূপ দৃশ্য দেখা যায় বালবিধবা 'উমা'-র প্রতি। উমা জয়রামবাটী অঞ্চলের মেয়ে। সে কলকাতায় তার দিদিমার সঙ্গে মায়ের বাড়ির কাছেই বাস করত। সে সারাদিন রাধুর সঙ্গেই মায়ের বাড়িতে কাটাত। মাও তাকে রাধুর সঙ্গে সমান যত্নে পালন করতেন। ''মা উভয়কে স্বহস্তে তৈল মাখাইয়া দিতেন, স্নান করাইয়া দিতেন, খাইতে দিতেন। জনৈকা মহিলা একদিন মন্তব্য করেন,—আচ্ছা মা, উমা তিলির মেয়ে, আর রাধু বামুনের মেয়ে, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রী; তুমি কি করে ওকে রাধুর মর্য্যাদা দিচ্ছ? এতে উমার অপরাধ হচ্ছে, ওরই ভবিষ্যৎ খারাপ হবে।

''মা স্নেহার্দ্র কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—ওর জন্যে বড় ভাবনা হয়, অতটুকু মেয়ে,—বিধবা! ঠাকুর যেন ওর মান-ইজ্জত রক্ষে করেন।...

''অন্য একজন মন্তব্য করেন,—হ্যাঁ মা, আপনি তো ওকে খুবই আদর-যত্ন কচ্ছেন, বড় হলে ও যদি আপনার কথা না মেনে চলে?

''ঈষৎ হাসিয়া মা বলিলেন,—আমার স্নেহ-আশীর্ব্বাদ বিলিয়ে যাচ্ছি; তারপর যার যেমন ভাগ্যি, আর ঠাকুরের ইচ্ছে!''[২০]

স্বহস্তে সাদরে উমাকে কেবল সযত্নে স্নান-খাওয়ানোই নয়, মা তার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনাও করেছেন। অকাতরে স্নেহ-আশীর্বাদ মা এভাবে বিলিয়ে গেছেন সকল শিশুসন্তানের জন্য—জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শিরোমণিপুরের বাসিন্দা রসন আলি খাঁ-র উক্তিটি :

''তিনি আমাদের জন্যও তাঁর কোল পেতে দিয়েছিলেন।''[২১] তাঁর মাতৃদর্শন হয়েছিল ১৯১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে, তাঁর তেরো-চোদ্দো বছর বয়সে।

'সবার মা' কীভাবে নিঃশব্দে ছোটদের আবদার পূর্ণ করেছেন, সর্বগ্রাসী ভালবাসায় কীভাবে তাদের ব্যবহারকে সমর্থন করেছেন তারই এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত উনিশতম দৃশ্যে।

বলরামবাবুর পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে শ্রীমাকে বসু-ভবনের কাছে ৫৯/২ রামকান্ত বসু স্ট্রিটস্থ শরৎ সরকারের বাড়িতে রাখা হয়; কারণ বসু-ভবনে তখন চুনকাম করা হচ্ছিল। শরৎবাবু স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্য ও ভক্তিমান মানুষ ছিলেন, একমাস মা তাঁর বাড়িতে ছিলেন। শরৎবাবুর মাসতুতো ভাই নরেশচন্দ্র ঘোষ (গৌরবাবু) এই সময়কার একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। ''সরকার-বাড়ীতে গৌর প্রভৃতি আটদশ বছরের ছেলেরা রোজ দুপুরে বুড়ী-বুড়ী খেলা করিত। ছেলেদের মধ্যে সেদিন কেহ বুড়ী হইতে চাহিল না, মাকে বলিল, তুমি আমাদের বুড়ী হবে? মা ধীরে ধীরে যাইয়া বুড়ীর আসন ইটের উপর বসিলেন। মহা আনন্দে ছেলেরা মায়ের মাথায় হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছে ও একজন তাহাদিগকে তাড়া দিতেছে এমন সময় গোলমাল শুনিয়া গৌরের মা আসিলেন ও ছেলেদের কাণ্ড দেখিয়া ধমক দিয়া কহিলেন, 'বুড়ী করবার আর লোক পাও নি?' মাকে তিনি প্রণাম করিয়া ঘরে যাইতে অনুরোধ করিলেন। মা কহিলেন, 'ওদের তো একজন বুড়ী চাই; কেউ হতে চাচ্ছিল না, তাই আমিই বুড়ী হলুম!' ''[২২]

স্বামী অজ্ঞজানন্দজীর ভাষায় : ''সংসার-খেলায় মা-বুড়িই তো প্রধান খেলুড়ী,—বুড়ি চান খেলা চলুক, খেলা চালিয়েই তিনি মজা পান। খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তখন বুড়িকে ছুঁয়ে দিলেই তার বিশ্রাম! তবে না-খেলেই বুড়িকে ছোঁয়া কিন্তু বুড়ির একেবারেই 'না-পসন্দ'। অবশ্য বাঁকুর মতো সেয়ানা ছেলেও বিরল নয়, যারা বৃথা হয়রান না হয়ে অচিরেই মা-বুড়িকে ছুঁয়ে দিয়ে কিস্তিমাত করে ফেলে! সেক্ষেত্রেও তো বুদ্ধির প্রেরয়িত্রী মা নিজেই—'সিদ্ধিবুদ্ধিপ্রদে দেবি!'... চিরায়ত এই সংসারক্ষেত্রে বন্ধন-মুক্তির নিত্য ক্রীড়া চলছে—ক্রীড়াময়ী স্বয়ং মা—খেলার 'বুড়ি'। কাউকে খেলিয়ে ছুটিয়ে—চোখ বেঁধে ঘুরিয়ে দৌড় করিয়ে তার কালঘাম ছুটিয়ে ছাড়ছেন। কাউকে-বা আপনিই হাত বাড়িয়ে, ছোঁয়া দিয়ে খেলায় ছুটি করে দিচ্ছেন।''[২৩]

বিংশতিতম চিত্রটিতে মায়ের শিশু-ভোলানোর এক অপূর্ব দিব্য প্রসঙ্গ। ''সুরেশ্বর সেনের বাড়ি বিষ্ণুপুরে। সুরেশ্বর, গুণেশ্বর, সুধীরেশ্বর, মতীশ্বর ও বশীশ্বর—পাঁচ ভাই শ্রীশ্রীমার গুণমুগ্ধ। মা দেশ থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে এবং কলকাতা থেকে দেশে ফেরার পথে সুরেশ্বর সেনের বাড়িতে অবস্থান করে তারপর যাত্রা করতেন।

''সেদিন বিকালে মা তাঁর বাঁকুড়ার সন্তানদের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত। রাত্রের গাড়িতেই কলকাতা রওনা হবেন। এমন সময় গুণেশ্বরবাবুর বড়পুত্র অভীশ্বর (বয়স ৮/৯ বছর) ভীষণ বায়না ধরল। সে বলে সেও মায়ের সঙ্গে কলকাতা যাবে বড় বড় দুর্গাঠাকুর দেখতে। সে শুনেছে কলকাতায় খুব সুন্দর সুন্দর ঠাকুর হয়, অনেক বাজনা-বাদ্যি হয়, আতশবাজির মেলা বসে। অভীশ্বরের বায়নায় মা-র সন্তানরা বিরক্তবোধ করছেন কারণ তাঁরা মার সঙ্গে ভালভাবে কথা বলতে পারছেন না। সুরেশ্বরবাবু ও মতীশ্বরবাবু খোকাকে ভোলানোর চেষ্টা করছেন কিন্তু তার বায়না অস্বাভাবিক রকমের। কিছুতেই থামতে চাইছে না। নানা খাবার-দাবার দেওয়া হচ্ছে—তবু সে তার গোঁ থেকে সরছে না। ডাক্তার মহারাজ গিয়ে বোঝালেন। বিভূতিবাবু রাশভারী ব্যক্তি, তিনিও ধমক দিয়ে উঠলেন। তথাপি বালক থামতে চাইছে না। অগত্যা মাকে উঠতেই হলো।

মা বিভূতিবাবুকে বললেন, 'বাবা, ওকে বোকো না, তাতে হবে না।'

''মা বালককে সঙ্গে নিয়ে ঘরের বাইরে এলেন। বালক কিন্তু তাতেও শান্ত হতে চাইছে না। মা বালককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, কি নেবে?' বালক কান্নাভেজা কণ্ঠে জানাল, সে কলকাতার বড় দুর্গাঠাকুর দেখবে। সেখানে খুব বড় সিংহ আছে, বড় ময়ূরের ওপর কার্তিক বসে আছে। তখন মায়ের কোমল কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'দুর্গামা দেখবে, এইমাত্র?'... মুহূর্তে বালক স্তব্ধ। কান্না নেই, বায়না নেই। বালক বরফের মতো শীতল হয়ে গেল।

''মা আবার ফিরে এলেন তাঁর ভক্ত সন্তানদের মাঝে। ডাক্তার-মহারাজ মা-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা আপনি কি খোকার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, যে ও একেবারে শীতল হয়ে গেল।' মা বললেন, 'বাচ্চারা অমন বায়না করে বাবা, তাদের তো ভোলাতে হবে।'

''এ-ঘটনার অনেকদিন পরের কথা। মা তখন আর মর্ত্যধামে নেই। এক দুর্গাপুজোর সময় অভীশ্বর বিভূতিবাবুর গৃহে এসেছেন। সেই সময় তাঁরা বেশ কয়েকজন দুর্গামা দর্শনে বের হচ্ছেন। বিভূতিবাবু তাকেও সঙ্গে যেতে বললেন। উত্তরে অভীশ্বর বলে, 'জ্যাঠামশাই, আমি দীর্ঘকাল আর দুর্গামা দর্শন করি না। মা আমাকে সেই ছোটবেলায় যে জীবন্ত দুর্গামূর্তি দেখিয়েছেন, তাতেই আমার সব দর্শন হয়ে গেছে। সে মূর্তি ধরেই রেখেছি মনে, অন্য মূর্তি আর মনে ধরে না।' ''[২৪]

একবিংশতিতম ঘটনায় দেবস্বভাব সরল বালক শম্ভুনাথের সাধু হওয়ার ইচ্ছাপূরণে সন্তানবৎসলা মায়ের অনুমতিদান।

''শম্ভুনাথ নামে আট-দশ বৎসর বয়সের এক বালক একদিন তাহার আত্মীয়ের সহিত মাতাঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—মা, আমি সাধু হবো, বেলুড়মঠে থাকবো। আপনি মহারাজদের বলে দিলেই আমার থাকা হবে।

''সরল বালকের মুখে এমন কথা শুনিয়া মা হাসিতে হাসিতে বলেন,—কে তোমায় শিখিয়ে দিয়েছে খোকা, এসব কথা?

''—কেউ শেখায়নি মা। মাকে আমি একথা বলেছিলুম, মা বললে কি,—আমায় ছেড়ে কোথাও যাসনি তুই, তাহলে আমি বিষ খেয়ে মরবো। আমি বললুম,—কেন? তোমার তো আরো ছেলে রয়েছে। আমি বেলুড়মঠে গিয়ে সাধু হয়ে থাকবো। যদি সাধু হতে না দাও, আমি মরে যাবো, বাঁচবো না।

''মাতাঠাকুরাণী বালকের চিবুক ধরিয়া আদর করিলেন, বক্ষে জপ করিয়া দিলেন, নিজহাতে একটি সন্দেশ খাওয়াইয়া দিলেন। তারপর আবার প্রশ্ন করিলেন,—খোকা, মাকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে?

''—হ্যাঁ, ঠিক পারবো। আপনি একবার রেখেই দেখুন-না।

''জননীর প্রাণে দুঃখ দিয়া বালকটি হয়তো এই বয়সেই বৈরাগ্যের পথে চলিয়া যাইবে, ইহা ভাবিয়া কোমলপ্রাণা যোগেনমায়ের হৃদয় বিচলিত হয়। কাতরভাবে তিনি মাতাঠাকুরাণীর নিকট বলেন,—ছেলেটাকে ওর মায়ের কাছেই পাঠিয়ে দাও মা। আহা, দুধের ছেলে!

''—যোগেন, ওর এই শেষজন্ম। আয়ু অতি অল্প, যা শুভ ইচ্ছে এখনই করে নিক।

''আত্মীয়টি তাহাকে সঙ্গে লইয়া বেলুড়ে গেলেন। মঠে উপস্থিত হইয়া বালক ঠাকুরের পূজার আসনের সম্মুখে গড়াগড়ি দিল; স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ মহারাজদের পদধূলি লইল এবং সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিল। কিছুতেই সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে না, মঠে থাকিয়া সাধুদিগের সেবা করিবে। স্বামী প্রেমানন্দ তাহাকে অনেক প্রবোধ দিয়া তাহার জননীর নিকট পৌঁছাইয়া

দিলেন। আশ্চর্যের কথা, তিন-চারি সপ্তাহ পরেই সংবাদ আসিল, সেই দেবস্বভাব বালক এই মরজগৎ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।"[২৫]

অনুরূপ সুষমামণ্ডিত আর একটি স্মৃতিকথা। দ্বাবিংশতিতম চিত্র।

''একবার জগদ্ধাত্রীপূজার সময়ে রাঁচি থেকে একটি বালক জয়রামবাটী এসেছিল কারো সঙ্গে। পূজার মধ্যে মা খুবই ব্যস্ত থাকায় বালকটিকে কেউই সাহায্য করতে পারেননি মায়ের সঙ্গে একটু দেখা করিয়ে বা আলাপ করিয়ে দিতে। পূজা হয়ে গেলে সকলেরই ফেরার পালা। চলে যাওয়ার দিন খুব ভোরেই ভক্তেরা একেএকে মায়ের ঘরে গিয়ে তাঁর চরণ বন্দনা করে আসছিলেন। সবার শেষে সেই বালকটি একাকী মায়ের ঘরে ঢুকে যায় এবং মায়ের পাদপদ্মে মাথা রেখে অশ্রুজল ফেলতে থাকে। মায়ের পা ভিজে গেল বালকের চোখের জলে! মা তার হাত ধরে উঠিয়ে বললেন, 'কাঁদছ কেন, বাবা? কি চাও—মন্ত্র নেবে?' বালক ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তখনো কাঁদছে—মুখে কোনো কথা বলতে পারছিল না। মা কিন্তু কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই, তক্ষুনি সকলকে ঘরের বাইরে চলে যেতে আদেশ দেন। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন মা নিজ হাতেই। বালকের নয়নবারি মুছিয়ে, কাছে টেনে বসিয়ে তার কানে মহামন্ত্র দিয়ে দিলেন। দীক্ষাপ্রাপ্ত বালক পরমানন্দে নাচতে নাচতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—কোনো দিকে তার আর ভ্রুক্ষেপ ছিল না।"[২৬]

ত্রয়োবিংশতিতম চিত্রে মাতৃসান্নিধ্যে বালক গোবিন্দের কথা। গোবিন্দ নয়-দশ বছরের অনাথ বালক, শৈশবেই মা-বাবাকে হারিয়েছে। জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়িতে বাগালের কাজ করে, গরু-বাছুর দেখাশুনা করে, মাঠে চরাতে নিয়ে যায়। একবার খোস-পাঁচড়ার অসহ্য যাতনায় সারারাত কাঁদল সে। পরদিন ভোর না হতেই দেখা গেল, মা নিজ হাতে শিলনোড়াতে নিমপাতা-হলুদ বাটছেন, গোবিন্দের হাতে একটু একটু করে তুলে দিচ্ছেন। বলে দিচ্ছেন, কোথায় কেমন করে লাগাতে হবে। বাস্তবিকই গোবিন্দ ব্যাধিমুক্ত হয়েছিল, তার দেহের জ্বালা জুড়িয়েছিল মায়ের আপন হাতের সেবায়। ত্রিতাপ জ্বালার এক জ্বালা আধিভৌতিক জ্বালা। ত্রিতাপনাশিনী সারদার যত্নে বালকের আধিভৌতিক জ্বালার নিরসন হয়েছিল এভাবেই। মায়ের অনিন্দ্য এই মূর্তি—বিগ্রহধারিণী সেবা। জীবদুঃখহরা সারদা।

চতুর্বিংশতিতম চিত্র। ''একটি বালক, বছর বারো বয়স হবে—একদিন উদ্বোধনে এসে মাকে প্রণাম করেই কাঁদতে শুরু করে। কাঁদছ কেন? কাঁদছ কেন?—সবাই জানতে চাইছে। এক উত্তর 'মায়ের কৃপা চাই।' সকলেই ভাবল—ছেলেমানুষি। হাতে মিষ্টি দিয়ে বিদায় করে দিল তাকে। পরের দিন খুব ভোরে এসে উদ্বোধনের বাইরের দিকে রোয়াকে একা একা বসে আছে ছেলেটি। মাকে কিন্তু কেউই সে-কথা জানায়নি, বা সকলের চোখেও পড়েনি ছেলেটিকে। মা কিন্তু রাধুকে চুপি চুপি বললেন—'নিচে গিয়ে দেখবি, রাস্তার ধারে রোয়াকে বসে আছে একটা ছেলে। তাকে আমার কাছে নিয়ে আয় সঙ্গে করে।' রাধু যথা আদেশ পালন করে। ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে শ্রীশ্রীমা মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন অতি গোপনে। কিন্তু সামান্য ওই একরত্তি বালককে মন্ত্র দেওয়াতে গুঞ্জন উঠল মায়ের বাড়িতে। অনুযোগ শুনে মা জবাব দিয়েছিলেন, 'তা যাহোক বাপু, ছেলেমানুষ—কাল তো অমন করে পায়ে ধরে কাঁদলে! কে ভগবানের জন্য অমনটি কাঁদছে বল দেখি? এ মতি ক-জনের হয়?' ''[২৭]

একরত্তি সন্তানের ব্যাকুলতা উপলব্ধি করেই অন্তর্দর্শিনী মা তাকে কৃপা করতে এতটুকু দ্বিধা করেননি। অখিল গুরুশক্তি এবং বিশ্বমাতৃত্ব—এই

উভয় ভাবের সম্মিলিত উপাদানে গড়া ছিল শ্রীশ্রীমা সারদার দৈবী তনু।

পঞ্চবিংশতিতম চিত্রে এক বালকের 'সারদা-রাধা' দর্শনের অলৌকিক কাহিনি।

এক মা-হারা বালক—যার গর্ভধারিণীরও নাম ছিল সারদা—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' পড়ে জানতে পারে সকল মা-হারার এক আশ্চর্য মায়ের কথা। শ্রীশ্রীমায়ের তখন শেষ অসুখ। বালকটি একদিন মাতৃচরণপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং মায়ের চরণতলে লুটিয়ে পড়ে। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য বর্ণনা করেছেন : ''মার শেষ অসুখের সময় দর্শন করিতে গিয়া সে তাঁহার আদর-যত্ন লাভ করে এবং তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাঁহার কাছেই থাকিতে পায়।... মার চরণস্পর্শ করিয়া ছেলেটির একরূপ আবেশের মত অবস্থা হয়; এবং 'গুরু ও ইষ্ট অভেদ', 'ঠাকুর ও মা অভেদ', 'ঠাকুর মাকে জগদম্বারূপে পূজা করিয়াছিলেন, অতএব ইনিই মা-কালী', 'যিনি রাধা তিনিই সারদা'—এই চারিটি চিন্তার পরপর উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে অর্ধশয়ানা মার মূর্তির স্থানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি, ঠাকুর, মা-কালী এবং শ্রীরাধামূর্তি দর্শন করে। কালী-রূপ দর্শন করিবার সময় সে একপ্রকার ভয়ে অভিভূত হয়, মা শ্রীহস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করেন। রাধা-রূপ দর্শনের পর মা বলিয়াছিলেন, 'তুমি বৈষ্ণব বংশে জন্মেচ, সেই সুকৃতির ফলে এই দর্শন পেলে। যদি আর কখন এঁকে দর্শন কর, মা বলে ডেকো না।' ''[২৮]

স্বামী অজ্ঞজানন্দজীর কথায় বলতে হয় : ''উল্লিখিত বৃত্তান্তে একটি অসাধারণ অশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত কথা শ্রীশ্রীমায়ের মুখে শুনলাম, 'যদি আর কখন এঁকে দর্শন কর, মা বলে ডেকো না'। 'মা' ডাকতে মায়েরই মানা! বিচিত্র এই সারদাতত্ত্ব—সুদুর্বিজ্ঞেয়ই বটে। শ্রীপ্রভু তা-ই তো বলেছেন, 'অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়।' রাধা যখন সারদা—তখন তিনি অম্বা-মা—স্নেহপাথার জননী। আবার সেই সারদা যখন রাধা—তিনি তখন মধুরভাবের পরাকাষ্ঠা—প্রেমস্বরূপা—শান্তদাস্যাদি ভাবপঞ্চকের সমষ্টীকৃতা মহাভাবময়ী শ্রীমতী। তাই বুঝি শ্রীমতীকে মা বলে ডাকতে মানা।''[২৯]

শ্রীমার সমগ্র জীবনটি ছিল একটানা নীরব উপাসনা। পিতৃগৃহে অতি শৈশবকাল থেকেই তিনি ছোট ছোট ভাইদের সস্নেহে কোলে-কাঁখে করে বড় করে তুলেছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনী, মাকু, রাধারানিও শৈশব থেকেই মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় বড় হয়ে উঠেছিলেন। 'পিসিমা' 'মা'-তে পরিণত হয়েছিলেন। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবুও মায়ের স্নেহে বড় হয়েছেন, তাঁর ভিক্ষামাতা ছিলেন মা স্বয়ং। তাঁর আবদারে মা নিজের স্বরূপের কথা নিজমুখে বলেছেন। মায়ের বিচিত্র সংসারে এঁরা ছিলেন তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র। তৃতীয় পর্যায়ে তাঁর পরিবারের শিশুদের সঙ্গেও ছিল মায়ের মধুর সম্পর্ক। মায়ের ভ্রাতৃবধূ ইন্দুমতী দেবীর ছেলে ক্ষুদিরাম, অভয়কুমারের কন্যা রাধারানির পুত্র বনবিহারী (বনু) প্রভৃতি সকলের সঙ্গে মা গোপালভাবে ব্যবহার করতেন।

মা দিব্য স্নেহপ্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে—হামা দিয়ে আসা মাকুর শিশুপুত্র ন্যাড়ার দিকে নৈবেদ্যের কলা বাড়িয়ে বলেছেন—''খা, গোপাল খা।''[৩০] স্বল্পায়ু ন্যাড়ার মৃত্যুর পর মা অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেছিলেন, ''ছেলেটা কোন যোগভ্রষ্ট সাধক বা মহাপুরুষ ছিল। সামান্য একটু বাকি ছিল; সেটুকু ভোগ হয়ে গেল—শেষ জন্ম! এই বয়সের ছেলের মধ্যে অত সৎসংস্কার দেখা যায় না। কোথা থেকে রোজ গুলঞ্চ এনে আমার পায়ে দিয়ে পূজা করত।...'' তাঁর মনে জাগত, ন্যাড়া তাঁকে বলত 'সীতা'।[৩১] ইন্দুমতীর পুত্র ক্ষুদিরাম একবার মায়ের পায়ে মুঠো মুঠো ফুল দিয়ে প্রণাম করলে মা কোলে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, ''বাবা, তোরা যে আমার মুক্ত

হয়ে এসেছিস! আর ফুল দিতে হবে না।"[৩২] একবার সে মায়ের সঙ্গে কলকাতা যাওয়ার জন্য জেদ করলে মা তাকে ভোলানোর জন্য নিজের আঙুল থেকে শম্ভু রায়ের স্ত্রীর দেওয়া সোনার আংটি খুলে তাকে দিয়েছিলেন এবং কিছুটা মিছরি দিয়ে বলেছিলেন, যখনই মায়ের কথা মনে হবে তখনই যেন সে মিছরি খায়, তাহলেই মাকে ভুলে যাবে। ''ক্ষুদি যখন পরে তাহার জননীর সহিত কলিকাতায় আসিল, শ্রীমা তাহাদের সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কীরূপ মল পরিবে? সে জানাইল, সে নূপুরযুক্ত মল পরিবে। শ্রীমাও বলিলেন, 'বেশ তো, বাবা, গোপালের পায়ে নূপুর আছে, তোমার পায়েও থাকবে।' "[৩৩]

রাধুর ছেলে বনবিহারী বা বনুকে ঘুম ভাঙানোর জন্য শ্রীশ্রীমা সুর করে গাইতেন—

''উঠ লালজী, ভোর ভয়ো
সুর-নর-মুনি হিতকারী।
স্নান করো, দান দেহু—
গো-গজ-কনক-সুপারি ॥"[৩৪]

শ্রীশ্রীমা ছেলেটিকে গোপালের মতো চন্দন ও কাজল দিয়ে সাজাতেন। তাকে দেখতেও ঠিক গোপালের মতো সুন্দর লাগত। এভাবে শিশুদের দেবত্ব মায়ের পুজোয় জাগ্রত হয়ে তাদের দেবশিশুতে পরিণত করত। মায়ের কথাতেই বলতে হয়—''সাধকই তো দেবতাকে আনে।" মহামায়ার মানবী লীলার সবটুকুই অনির্বচনীয়। তিনি নিজের স্বভাবকোমল হৃদয়ের প্রকৃত আনন্দ ও স্ফূর্তি পেতেন ছোটদের সঙ্গে আচরণে।

বালক-বালিকারা মায়ের সান্নিধ্য পেতে চাইত। কেবল নিজ পরিবারের নয়, পল্লীর শিশুরাও তাঁর মুখে নানারকম ছড়া ও কাহিনি শুনতে সমবেত হত। তিনি তাদের সঙ্গে শিশুর মতোই হয়ে যেতেন; তাদের নানান আবদার রক্ষা করতেন। একদিন সন্ধ্যায় রাধারানি মাকে আবদার জানায়, তাকে গান শোনাতে হবে। মাও সুর করে বললেন, ''বন থেকে বেরুল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে...।" কিন্তু তা রাধুর পছন্দ হল না—সে বলল, ''এটা শুনেছি, নতুন একটা বল।" মা আবার শুরু করলেন, ''ঝিকিমিকি তারা বনকে বাদুরা...।" রাধারানি এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে বলল, ''তুমি একটা গান গাও।" মা অগত্যা সুর করে গান গাইলেন—

''কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন, মোহনমুরলীধারী।..."[৩৫]

শিশুদের প্রতি স্নেহময়ী সারদার চরিত্রের হৃদয়স্পর্শী, সরল ও মধুর দিকটি ভগিনী দেবমাতার স্মৃতিচারণে সুন্দররূপে চিত্রিত হয়েছে :

''তাঁর সঙ্গে থাকত আট বছরের ভাইঝি রাধু। তার মতোই শিশুর খেলায়, রঙ্গে তিনি মেতে উঠতে পারতেন। একবার আমি রাধুর জন্য ইংরেজি দোকান থেকে 'জ্যাক ইন দ্য বক্স' খেলনাটি নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটি নিয়ে তাঁর খুশির দৃশ্যটি আমি এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। যতবার পুতুলটি শব্দ করে বাক্স থেকে লাফিয়ে উঠছে ততবারই তিনি শব্দটির নকল করে হেসে লুটিয়ে পড়ছেন।

''আর একদিন আমি গিয়ে দেখি তিনি কাচের পুঁতির মালা গাঁথছেন। রাধুই কারণটা জানাল : '...আমার গোপালের কোনও গয়না নেই।' কিন্তু মায়ের কাজে কোনও ছলনা ছিল না। এই ছোট্ট খেলনা-পুতুলটিকেই তিনি প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন এবং যেমন করে একজন ভক্তিমতী সন্ন্যাসিনী শিশু যিশুর জন্মদিনে তাঁকে আচ্ছাদনে ভূষিত করেন তেমনি করেই তিনি সেটিকে আভরণে ভূষিত করছিলেন।"[৩৬]

জননী সারদা শিশুদের কখনও 'গোপালভাবে' আবার কখনও 'নারায়ণভাবে' যেমন গ্রহণ করেছেন, তেমনি পক্ষিমাতার মতো স্নেহপক্ষ বিস্তার করে তাঁর সান্নিধ্যে আগত ছোট ছোট

শিশুদের রক্ষাও করেছেন—সকলের অলক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে স্বীয় দৈবশক্তি প্রয়োগ করে।

মায়ের দৈবী স্নেহস্পর্শলাভে ধন্য শিশুদের জীবনে এর প্রভাব বিষয়ক একটি উদ্দীপক স্মৃতিকাহিনি স্বামী নির্লেপানন্দ মহারাজের কাছ থেকে সংগ্রহ করে বর্তমান প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করা যেতে পারে। মায়ের চিকিৎসক দুর্গাপদবাবুর বিবাহিতা কন্যা শ্বশুরবাড়িতে মারা গেলে তিনি শোকে প্রচণ্ড ভেঙে পড়েছিলেন। আরও এই জন্য যে, মৃত্যুর হেতু অস্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছিল। দুর্গাপদবাবু প্রতিদিনই উদ্বোধনে পূজ্যপাদ সারদানন্দজীর কাছে এসে বসতেন এবং প্রয়াতা কন্যার জন্য কান্নাকাটি করতেন। একদিন, কন্যার কী গতি হবে—অপমৃত্যু কি তার আত্মার শান্তিতে বিঘ্নকর হবে না?—এসব বলে বিলাপ করছিলেন তিনি। সারদানন্দজী সহানুভূতিতে ও করুণায় বিগলিত হয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তিতভাবে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ''আচ্ছা, ওকে কখনও মার কাছে এনেছিলেন?'' দুর্গাপদবাবু উত্তর দিলেন, ''হ্যাঁ মহারাজ, ছেলেবেলায় মা ওকে কোলে নিয়েছেন—একবার নয়, কতবার! কত প্রসাদ খাইয়েছেন মা নিজের হাতে। ছেলেবেলায় ও দেখতে ফুটফুটে সুন্দর ছিল।'' সারদানন্দজী হাঁফ ছেড়ে বললেন, ''তবে আর কী ডাক্তার? যেভাবেই শরীর যাক, ও-মেয়ের কখনও অসদ্‌গতি হবে না নিশ্চিত জেনো।''[৪০]

ইহকাল-পরকালের মায়ের প্রতি এমন হৃদয়স্পর্শী বিশ্বাস-সঞ্চারণ দুর্লভ।

জ্ঞান-ভক্তি-মুক্তিদায়িনী মায়ের স্নেহনির্ঝরে সুস্নাত যারা, তাদের জীবন ধন্য। মাতৃলীলায় যে-ঐশ্বর্য যে-মাধুর্য প্রকাশিত হয়েছে, তারই মাত্র কয়েকটি এখানে পরিবেশিত হল। মাতৃরূপা মহামায়াকে—শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাববিগ্রহ শ্রীমা সারদাকে জানাই ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম।

তথ্যসূত্র

১৮। দ্রঃ সম্পাদনা : প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা, *জন্মজন্মান্তরের মা : শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, শ্রীসারদা মঠ, কলকাতা, পৃঃ ৩৭২-৭৩ [এরপর, *জন্মজন্মান্তরের মা*]

১৯। দ্রঃ *শঙ্খনাদ* : রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বাঁকুড়া, শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ, ১৯১৭-২০১৮, পৃঃ ৩২২-২৬

২০। শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, *সারদা-রামকৃষ্ণ*, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, কলকাতা, ১৩৬৬, পৃঃ ২৮৪-৮৫

২১। সঙ্কলক ও সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে*, উদ্বোধন কার্যালয়, খণ্ড ৩, ২০১১, পৃঃ ৬৬০

২২। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, *শ্রীশ্রীসারদাদেবী*, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৪২২, পৃঃ পৃঃ ৭২-৭৩

২৩। দ্রঃ স্বামী অজ্ঞজানন্দ, *প্রকৃতিং পরমাম্ :* (শ্রীশ্রীমা সারদার চরিতানুধ্যান), অখণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২৩, পৃঃ ১৪৬

২৪। তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *নবযুগের দিশারী শ্রীশ্রীমা সারদা*, দেবসাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ২২-২৩

২৫। *সারদা-রামকৃষ্ণ*, ১৩৬১, পৃঃ ১৮৩-৮৪

২৬। *প্রকৃতিং পরমাম্*, পৃঃ ২৭০-৭১

২৭। তদেব

২৮। *শ্রীশ্রীসারদাদেবী*, পৃঃ ১৬৭-৬৮

২৯। *প্রকৃতিং পরমাম্*, পৃঃ ৭৭-৭৮

৩০। দ্রঃ স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদা দেবী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৪, পৃঃ ২৫০

৩১। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ২৫০-৫১

৩২। তদেব, পৃঃ ২৫২

৩৩। তদেব, পৃঃ ২৫১

৩৪। তদেব

৩৫। দ্রঃ *সারদা-রামকৃষ্ণ*, ১৩৬৬, পৃঃ ২১১

৩৬। দ্রঃ *জন্মজন্মান্তরের মা* , পৃঃ ২৯৪

৪০। দ্রঃ *প্রকৃতিং পরমাম্*, পৃঃ ৩২৪